# বেঙ্গল টাইমস

১৬ নভেম্বর, ২০২৪

## এ কলকাতার মধ্যে আছে আরেকটা কলকাতা

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in

## সম্পাদকীয়

# কল্লোলিনীর মুকুটে

পুজোর রেশ আগেই কেটে গেছে। এখন যাই যাই হেমন্ত। যত দিন যায়, ঋতুগুলো কেমন যেন আবছা হতে থাকে। নিন্দুকেরা বলেন, এখন বারো মাসের মধ্যে এগারো মাস গরম কাল। বাকি এক মাসের মধ্যে কুড়িয়ে বাড়িয়ে বাকি পাঁচটা ঋতু কুলিয়ে যাবে। অর্থাৎ, কয়েকদিন বর্ষাকাল, কয়েকদিন শীতকাল। শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত বলে বাস্তবে কিছু নেই। কল্পনা বিলাসী মন হালকা শীতের মাঝে হেমন্তকে বা যাই যাই শীতে বসন্তকে খুঁজে নিতে পারে।

একসময় রচনা আসত হেমন্তকাল, বসন্তকাল। বহু বছর পরীক্ষায় বোধ হয় সেই রচনা আসেনি। রচনার বইয়েও কি রচনাগুলো আছে? জানা নেই। মাঝ নভেম্বর যেন একটু একটু করে শীতকে স্বাগত জানানোর মরশুম। এরই মাঝে কলকাতার মাথায় আরও একটা পালক। বিশ্বের অন্যতম সেরা পর্যটন শহরগুলির মধ্যে জায়গা পেয়েছে আমাদের কলকাতা। কারা দিল, তার ভিত্তি কী,

তা নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে নানা যুক্তি থাকতেই পারে। বা এতে সরকারের সাফল্য কোথায়, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতেই পারে। আপাতত সেসব সরিয়েই রাখা যাক। কলকাতা, বাংলা কোথাও স্বীকৃতি পেলে ভালই লাগে। নিন্দুক সত্তা না হয় আপাতত সিন্দুকে তোলা থাক।

কলকাতার ঐতিহ্য, পরম্পরা এসব নিয়ে বিশেষ সংখ্যা হতেই পারত। পরে করাই যায়। আপাতত এই সংখ্যা পাঁচমিশেলি। আগামী কয়েক মাস একসঙ্গে অনেকেরই জন্ম শতবর্ষ। সেই দিকপাল মানুষদের নিয়েও বিশেষ সংখ্যা করার ইচ্ছে আছে। আর শীতে পর্যটন তো আছেই।

# এ কলকাতার মাঝেই তো আরেকটা কলকাতা

মলয় সিনহা

‘এ কলকাতার মধ্যে আছে আরেকটা কলকাতা/ হেঁটে দেখতে শিখুন।’ সেই কতকাল আগে লিখে গিয়েছিলেন কবি শঙ্খ ঘোষ। মাঝে মাঝেই প্রশ্ন জাগে, আমরা কি সত্যিই আমাদের এই প্রাণের শহরকে ঠিকঠাক চিনি? আমরা কি সত্যিই হেঁটে দেখতে শিখেছি! আমরা কি এই কলকাতার মধ্যে আরেকটা কলকাতার সন্ধান পেয়েছি!

আসলে, আন্তর্জাতিক সাফল্য বা স্বীকৃতি না এলে বাঙালি ঘরের মানুষকে ঠিক চেনে না। রবীন্দ্রনাথ নোবেল না পেলে তিনি কি এতখানি শ্রদ্ধার পাত্র হতেন? আর

দশজন কবির সঙ্গে কি আমরা তাঁকে গুলিয়ে ফেলতাম না! সত্যজিৎ রায় অস্কার না পেলে তিনি কি আমাদের কাছে 'বিশ্ববরেণ্য' হয়ে উঠতেন! অর্থাৎ, বিশ্ব যখন চিনিয়ে দেয়, তখন আমরা চিনতে শুরু করি।

সম্প্রতি বিশ্বের এক নামী পর্যটন সংস্থা কলকাতাকে বিশ্বের সেরা শহরগুটির তালিকায় রেখেছে। আমাদের প্রচলিত ধারণা, পর্যটন মানেই বুঝি পাহাড়, জঙ্গল বা সমুদ্র। এই তিনটের কোনওটাই কলকাতায় নেই। তাই কলকাতা যে পর্যটনের গন্তব্য হতে পারে, এটা আমরা সেভাবে তলিয়ে দেখিনি। কলকাতা খুব ভাল ঘোরার জায়গা, অনেককিছু দর্শনীয় জায়গা আছে, শুধু এই কারণে এই স্বীকৃতি নয়। কলকাতার ইতিহাস, পরম্পরা, কলকাতার উন্নয়ন, কলকাতার কৃতী মানুষ— সব মিলিয়েই এই স্বীকৃতি। অর্থাৎ, একটি স্বীকৃতি যেন একছাতার তলায় অনেক সাফল্যের মালা গেঁথে দিয়ে গেল। এই শহরের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে ইতিহাস। ১৯১১ পর্যন্ত এই কলকাতাই ছিল ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী। মুঘল সম্রাটদের দিল্লি নয়, সাহেবরা বেছে নিয়েছিলেন গঙ্গার পাড়ের এই শহরকে। দেশের অনেককিছুই কলকাতায় প্রথম। অর্থাৎ, কলকাতা পথ দেখিয়েছে, তারপর বাকি ভারত তাকে অনুসরণ করেছে। স্বাধীনতা আন্দোলনে বড় ভূমিকা ছিল কলকাতা ও বাংলার। সেই কারণেই বঙ্গভঙ্গের আয়োজন, সেই কারণেই রাজধানী স্থানান্তর। সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সিনেমা, গানবাজনা, বিজ্ঞান, ইতিহাসচর্চা, খেলাধূলা— সব ব্যাপারেই কলকাতা যেন অগ্রণী।

পরের দিকেও এই ধারা বজায় থেকেছে নানা ক্ষেত্রে। দেশের প্রথম মেট্রো রেল যেমন কলকাতায়, তেমনই প্রথম মোবাইলও চালু কলকাতায়। চলচ্চিত্র উৎসব হোক বা বইমেলা, কলকাতা এখনও অনন্য। ইডেনের খেলা হোক বা যুবভারতীর মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল— এই উন্মাদনা আর কোথায়! একেকটা অলি গলিতে কত ইতিহাস। উত্তর কলকাতার রাস্তায় হাঁটলেই মনে হয়, এখানে হাঁটতেন রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, সারদামণির মতো কিংবদন্তিরা। সেই ইতিহাসও তো পর্যটনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা শুধু বেড়ানোর জায়গা নয়। কলকাতার পতাকাকে সারাদেশে আরও উজ্জ্বল রাখার স্মারক।

আসলে, আমাদের গর্বের মুকুটে এত পালক রয়ে গেছে, আমরা কখনও ভেবে দেখতেও শিখিনি। কিন্তু এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির পর কি আমাদের চোখ খুলবে! আমরা কি নিজের শহরকে হেঁটে দেখতে শিখব! আরও ভাল করে চিনতে শিখব!

বেঙ্গল টাইমস

# অপু থেকে হরিহর হরিহর থেকে অপু

ময়ূখ নস্কর

হরিহর ল্যাপটপ খুলিয়া অফিসের বকেয়া কাজ শেষ করিতেছিল- এমন সময় সর্বজয়া অপুকে লইয়া গিয়া বলিল, ওগো ছেলেটাকে একটু ধরো না?... ধরো দিকি একটু! হরিহর বলে- উঁহু, ওসব গোলমাল এখন এখানে নিয়ে এসো না, বড় ব্যস্ত। সর্বজয়া রাগিয়া ছেলেকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়।

খোকা মাত্র দুইটি কথা বলিতে শিখিয়াছে। মনে সুখ থাকিলে মুখে বলে জে-জে-জে-জে এবং দুধে-দাঁত বাহির করিয়া হাসে। মনে দুঃখ হইলে বলে, না-না--না-না।

হরিহর কাজ করিতে করিতে হঠাৎ দেখে ছেলে তাহার মোবাইলটা মুখে লইয়া চুষিতেছে। হরিহর ফোনখানা কাড়িয়া লইয়া বলে, আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আমি আছি একটা কাজ নিয়ে!

হঠাৎ একটা চড়ুই পাখি আসিয়া হরিহরের ফ্ল্যাটের একফালি বারান্দায় বসে। শহরে চড়ুই পাখি আজকাল দুর্লভ। খোকা বাবার মুখের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া সেদিকে দেখাইয়া হাত নাড়িয়া বলে- জে-জে-জে-জে- হরিহরের বিরক্তি দূর হইয়া গিয়া ভারি মমতা হইল।

অনেক দিন আগের কথা তাহার মনে পড়িল। তখন হরিহর নিজেই অপু ছিল। আর তাহার বাবা ছিলেন হরিহর।

কয়েকদিন জ্বরে ভোগার পর অপু (আজকের হরিহর) বিছানায় শুইয়া ছিল। খেলা বন্ধ, তাই গৃহবন্দি হইয়া বোর হইতেছিল। তাহার বাবা অফিস হইতে ফিরিয়া একটা প্যাকেট তাহার হাতে দিয়া বলিলেন- দ্যাখো তো খোকা, কি বল দেখি?

অপু তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিল; উৎসাহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল- নতুন বই? না বাবা?

অপু তখনও একা একা বই কিনিতে শেখে নাই। কলেজ স্ট্রিট তাহার কাছে রাজপুতানার মরুপর্বত কি দিল্লি-আগ্রার রংমহলের মতোই দূরদিগন্তের কোনও অজানা দেশ। তাহার

বাবাই তাহার জন্য বই কিনিয়া আনে।

অপু বাবার হাত হইতে তাড়াতাড়ি প্যাকেটটা লইয়া দেখিল- বড় বড় অক্ষরে 'পথের পাঁচালি' কথাটা লেখা। সে বলিল, এটা কি ছোটদের বই বাবা?

তাহার বাবা জানিতেন না। তিনি কখনও সম্পূর্ণ পথের পাঁচালি পড়েন নাই। কিন্তু স্কুলের সিলেবাসের বাহিরেও যাহা কিছু শিখিবার আছে ছেলেকে তাহা শিখাইবার জন্য তাঁহার একটা অদম্য অপ্রশমনীয় পিপাসা।

তখনকার বাবারা এমনটাই ছিলেন। তাহারা ভাবিতেন, এই বই তাহার সন্তানকে অপরের দুঃখে চোখের জল ফেলিতে শিখাইবে, মার্কশিটের নম্বরের মূল্য কি ইহার চাইতেও বেশি?

তখনকার বিদ্যালয়গুলিও ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। সেখানে প্রসন্ন গুরুমশাইদের সন্ধান মিলিত। যাঁহারা শাসনের সময় দণ্ডপাণি হইলেও, শ্রুতিলিখনের সময়, 'জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরির' বর্ণনা শুনাইয়া, পড়ুয়াদের কচি কর্ণে মহামধুর কুহকের সৃষ্টি করিতেন, নীলকুন্তলা সাগরমেখলা ধরণীর সহিত তাহাদের পরিচয় করাইয়া দিতেন।

তখনকার খোকা খুকিরাও অন্য প্রকারের ছিল। ভিডিও গেমস না খেলিয়া তাহারা কুঠির মাঠে নীলকণ্ঠ পাখি দেখিতে যাইত, তাহাদের বাবা তাহাদের লইয়া যাইতেন, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার না হইয়া তাহারা রাজু রায়ের ন্যায় আষাঢুর হাটে তামাকের দোকান খুলিতে চাহিত। তখন তাহারা নির্জন দুপুরে, মায়ের পাশে শুইয়া চাঁদের পাহাড় পড়িত। যাহারা পড়িতে শেখে নাই, তাহাদের মায়েরা দিদি নাম্বার ওয়ান না দেখিয়া সন্তানকে পড়িয়া পড়িয়া শোনাইতেন।

অনন্ত কালপ্রবাহের সহিত পাল্লা দিতে গিয়া সেইসব দিন কুটার মতো, ঢেউয়ের ফেনার মতো ভাসিয়া গিয়াছে। ইছামতির চলোর্মিচঞ্চল স্বচ্ছ জলধারা কচুরিপানার দামে মজিয়া গিয়াছে। সিলেবাসের অন্ধকূপে মুখ ঢাকিয়া পথের পাঁচালির নির্বাচিত অংশ বাধ্যতামূলক হইয়াছে। পরীক্ষার নোট মুখস্থ করিতে করিতে আজকের অপুরা ক্রমে হরিহর হইয়া ওঠে।

নোট মুখস্থ করিতে করিতে রাত্রি গভীর হয়। হেমন্তের আঁচ লাগা শিশিরার্দ্র নৈশ বায়ুর প্রবেশ

রোধ করিয়া এসি-র বাতাসে ভরিয়া যায় তাহাদের বেডরুম। সভ্যতার চোখ-ধাঁধানো, অশোভন আলোয় কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্না আপন অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। আলো আঁধারের অপরূপ মায়ায় পূর্ণ যে রাত ঘুমন্ত পরীর দেশের মত রহস্যে ভরা, তাহা অপুদের অগোচরেই থাকিয়া যায়।

তবুও এক এক দিন এমন সময় অপুর ঘুম ভাঙিয়া যায়। শনশন করিয়া হঠাৎ এক ঝলক হাওয়া ড্রয়িং রুমের সৌখিন পর্দা উড়াইয়া বহিয়া যায়। কোথা হইতে ছাতিম ফুলের উগ্র সুবাস ভাসিয়া আসে। অপুর মনে হয়, সেই কবি যেন আসিয়াছেন, ঔপন্যাসিক নন কবি, পথের কবি, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অপুরা তাহাকে ভুলিতে বসিলেও, তিনি কিন্তু অপুদের ভোলেন নাই। হরিহরদের ভোলেন নাই। প্রয়াণের ৫৫ বছর পরেও তিনি তাহাদের সোনাডাঙার মাঠে, মধুখালির বিলে, ধলচিতের খেয়াঘাটে, সলতেখাগি তলায় লইয়া যান। মাঝেরপাড়া স্টেশনে লইয়া যান। লোকজন, তামাকের গাঁট, হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা হিরু গাড়োয়ান, সকলকে পিছনে ফেলে যে রেলগাড়ি বাহিরের উলুখড়ের মাঠ চিরিয়া ছুটিয়া গিয়াছিল, তাহাকে তিনি আবার মাঝেরপাড়া স্টেশনে ফিরাইয়া আনেন। বালক পুত্রের হাত ধরিয়া যুবক অপু আবার নিশ্চিন্দিপুরে ফিরিয়া আসে।

হরিহর ঘুম ভাঙিয়া ওঠে। ল্যাপটপ ফেলিয়া ওঠে।

মোবাইল লইয়া ক্রীড়ারত নিজের সন্তানের চোখের দিকে তাকাইয়া নিজের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পায়। মনে পড়িয়া যায় অমল শৈশবের কথা, তাহার নিজস্ব এক নিশ্চিন্দিপুরের কথা।

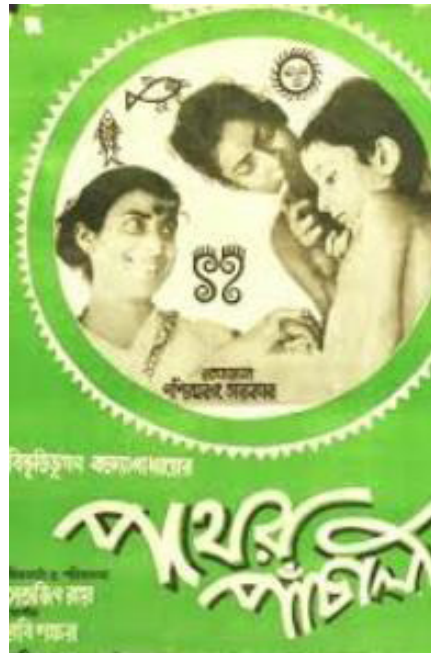


আজ কতদিন সে সেই নিশ্চিন্দিপুর দেখে নাই! কতকাল!

হঠাৎ সে কাঁদিয়া আকুল হয়। উচ্ছ্বসিত চোখের জল ঝর-ঝর করিয়া তাহার কপোল ভাসাইয়া দেয়, চোখ মুছিয়া হাত উঠাইয়া আকুল সুরে মনে মনে বলে- আমার যেন নিশ্চিন্দিপুরে ফেরা হয়, আমার সন্তান যেন নিশ্চিন্দিপুরে যেতে পারে – হে বিভূতিভূষণ- তুমি এই কোরো, আমাদের ঠিক যেন নিশ্চিন্দিপুরে যাওয়া হয়-পায়ে পড়ি তোমার-

পথের কবি প্রসন্ন হাসেন। কোনও কথা না বলিয়া হাত তুলিয়া তাহাকে আহবান জানান, ধুলো পড়া বইয়ের তাকের দিকে। ইছামতীর দিকে, আরন্যকের দিকে, চাঁদের পাহাড়ের দিকে, মিসমিদের কবচের দিকে... পথের পাঁচালির দিকে...

হরিহর ল্যাপটপ বন্ধ করিয়া, অপুকে লইয়া সেইদিকে এগিয়ে যায়।

# একটি কাগজ এবং বদলে যাওয়া দৃষ্টিকোণ

## হরিশ মুখার্জি

বাঙালি এখন আর নিজের কানে হাত দেয় না। সে কাকের পেছনেই ছোটে। হঠাৎ, এমন দুটো লাইন পড়ে একটার সঙ্গে আরেকটা মেলানো কঠিন। যাঁরা মেলানোর, তাঁরা ঠিক মেলাতে পারেন। সেই পুরনো প্রবাদ, কাকে কান নিয়ে গেছে শুনে কানে হাত না দিয়ে কাকের পেছনে ধাওয়া করা।

ফেসবুক জমানায় এটা আরও বেড়েছে। পুরো পোস্ট বা লেখা পড়ার দায় নেই। যা হোক একটা মন্তব্য করে দিলেই হল। চটিচাটা, তৃণমূলের দালাল এইসব শব্দবন্ধগুলো কমেন্ট বক্সে চোখ রাখলেই ধরা পড়ে। অনেক আগেই খবর ছড়িয়েছিল, এই সময় কাগজ কিনে নিচ্ছেন ভাইপো। খবরটা একেবারে মিথ্যেও নয়। ভাইপো মানে, সরাসরি ভাইপো নয়। তাঁর পেটোয়া কেউ। সঙ্গে কয়েকটা ভুলভাল নাম জড়িয়ে কিছুটা গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা।

সবাই ধরেই নিয়েছিলেন, এই কাগজ তৃণমূলের মুখপত্র হয়ে উঠবে। নির্লজ্জভাবে পিসি আর ভাইপোর গুণকীর্তন করে যাবে। সেটা ভাবাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু হয়েছে উল্টোটা। এমন এমন প্রতিবেদন এখানে প্রকাশিত হচ্ছে, মনেই হবে না, এর পেছনে ভাইপো থাকতে পারে। তৃণমূলের বিপক্ষে যাবে, এমন খবর রোজই বেশ কয়েকটা থাকছে। কোনও খারাপ কাজকে জোর করে জাস্টিফাই করার চেষ্টাও নেই। আরজি কর ইস্যুতে এমন এমন খবর হয়েছে, যা অন্য কাগজগুলিকে দশ গোল দিয়েছে। তারা হয় এই খবর পায়নি, অথবা পেলেও ছাপার সাহস দেখায়নি। কিন্তু এই সময় সেইসব খবরকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই ছেপেছে।

এই পর্যন্ত ঠিকঠাকই ছিল। কিন্তু বিগড়ে গেল কার্নিভালের দিন। সেদিন মুখ্যমন্ত্রীর কার্নিভালের থেকেও বেশি গুরুত্ব পেয়ে গেল দ্রোহের কার্নিভাল। ব্যস, আর যায় কোথায়! শোনা যায়, তারপর থেকেই বিজ্ঞাপন বন্ধের ফতোয়া জারি হয়ে গেল। সেই থেকে এই কাগজে আর কোনও সরকারি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। ভাইপোর ঘনিষ্ঠ লোক কাগজের মালিক, তারপরেও সেই কাগজের ওপর দিদিমণিই এত চটেছেন কেন? জটায়ু থাকলে বলতেন, হাইলি সাসপিসিয়াস।

সবাই ধরেই নিয়েছিলেন, এই কাগজ তৃণমূলের মুখপত্র হয়ে উঠবে। নির্লজ্জভাবে পিসি আর ভাইপোর গুণকীর্তন করে যাবে। সেটা ভাবাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু হয়েছে উল্টোটা। এমন এমন প্রতিবেদন এখানে প্রকাশিত হচ্ছে, মনেই হবে না, এর পেছনে ভাইপো থাকতে পারে। তৃণমূলের বিপক্ষে যাবে, এমন খবর রোজই বেশ কয়েকটা থাকছে। কোনও খারাপ কাজকে জোর করে জাস্টিফাই করার চেষ্টাও নেই। আরজি কর ইস্যুতে এমন এমন খবর হয়েছে, যা অন্য কাগজগুলিকে দশ গোল দিয়েছে।

পরে কী সমীকরণ তৈরি হবে, বলা মুশকিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই বিজ্ঞাপনের দরজা খোলেনি। কাগজের সুর বদলেরও তেমন ইঙ্গিত নেই। মাঝখান থেকে ভাইপোর সেই ঘনিষ্ঠ আইনজীবী আইনি ব্যাপারে আরও কোণঠাসা হলেন। সরকারি মামলায় একসময় তিনিই ছড়ি ঘোরাতেন, এখন রাজ্য আর তাঁকে ভরসা করে না।

কিন্তু ফেসবুকের বামেদের এসব ভাবতে বা বুঝতে বয়েই গেছে। তাঁদের কাছে হিসেবটা পরিষ্কার, ভাইপো কিনেছে মানেই পিসির চটিচাটা। কী খবর বেরোলো, বিজ্ঞাপন আসছে কিনা, বা না এলে কেন আসছে না,এসব ভাবতে বা বুঝতে তাঁদের বয়েই গেছে। তাঁরা মহাবিপ্লবী। অতএব চটিচাটা বলতে পারলেই তাঁদের যত আনন্দ।

বিষয়টা নিছক একটি কাগজের এডিটোরিয়াল পলিসি নয়। এর রহস্য আরও জটিল। ভাবুন, ভাবুন, ভাবা প্র্যাকটিস করুন।

# একই গান, কিন্তু টেক্কা দিয়ে গেছেন অন্যদের

একই গান। কিশোর গেয়েছেন, অন্যরাও গেয়েছেন। কিন্তু রফি, লতা বা আশা নয়, মহাকালের বিচারে শেষমেষ থেকে গেছে কিশোরের গানটাই। মানুষ ‘অশিক্ষিত’ গায়কের গানকেই বুকে ঠাঁই দিয়েছেন। এমনই অনেক গানের কথা তুলে ধরলেন কুণাল দাশগুপ্ত।

স্টিফেন হকিংয়ের সৌজন্যে ব্রহ্মাণ্ড রহস্য হাতের মুঠোয় এলেও এ রহস্যের দূরত্ব কয়েক আলোকবর্ষ। সঙ্গীত বিশেষজ্ঞদের স্নায়ুতন্ত্র বিবস হয়ে গেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসাচিহ্ন অমরত্ব লাভ করে জ্বলজ্বল করে চলেছে প্রশ্নটির পাশে। কেন কোনও রাষ্ট্রীয় পুরস্কার না পাওয়া এক ‘অশিক্ষিত’ গায়কের সঙ্গে দৌড়ে বারে বারেই পিছিয়ে পড়তে হয়েছে সারেগামা গুলে খাওয়া শিল্পীদের? মহম্মদ রফি, লতা মঙ্গেশকার, আশা ভোসলে, পরভীন সুলতানাদের কীভাবে কৃশাণু দে সুলভ ড্রিবলিংয়ে বারেবারেই টপকে গিয়েছিলেন কিশোর কুমার।

ট্যান্ডাম সং-এ (একই গান যখন দুই ভিন্ন শিল্পী গায়) দেখা গিয়েছে কিশোর কুমার তাবড় তাবড় শিল্পীদের থেকে জনপ্রিয়তায় কয়েক যোজন এগিয়ে থেকেছেন। কখনও বা অন্যজনের জামানত জব্দও হয়ে গিয়েছে। ‘প্যার কা মৌসম’ ছবির কথাই ধরা যাক। ‘তুম বিন যাউ কাঁহা’ কিশোর কুমার এবং মহম্মদ রফি দুজনেই গেয়েছিলেন । কোনও সন্দেহ নেই, কিশোর কণ্ঠ এখানে অনেকটাই এগিয়ে। তর্কের খাতিরে বলা যেতে পারে, ‘একদিন পাখি উড়ে যাবে যে আকাশে’র সুরে গাওয়া এই গান রাহুল দেব বর্মণ কিশোর কুমারকে ভেবেই তৈরি করেছিলেন। তাহলে মুনিমজি ছবি ‘জীবন কে সফর মে রাহি’র ব্যাখ্যা কী হবে ? এখানে লতা মঙ্গেশকার প্রায় নক আউটই হয়ে গিয়েছেন। লতাকে কিশোর কুমার ছাপিয়ে গিয়েছিলেন সমঝোতা ছবির ‘সমঝোতা গমো সে করলো’ ‘শর্মিলি’ ছবির

কিশোরের থেকে পিছিয়ে ছিলেন জনপ্রিয়তার দৌড়ে।

'কী আশায় বাঁধি খেলাঘর' কার গান? সবাই একবাক্যে বলবেন কিশোর কুমারের কথা। কিন্তু ঘটনা হল, তারও অনেক আগে রেডিওতে গানটি রেকর্ড করেন শ্যামল মিত্র। অমানুষ ছবিতে সেই শ্যামলই ছিলেন সুরকার। ভোর হয়ে আসার মুহূর্তে নৌকার পাটাতনে দাঁড়িয়ে উপযুক্ত কোনও গান খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তখন নিজের রেকর্ড করা সেই পুরানো গানটাই গাইয়ে ছিলেন কিশোর কুমারকে দিয়ে। বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া একটা গান যেন অমরত্ব পেয়েছিল কিশোরের গলায়।

'খিলতেহে গুল ইঁহা' তেও। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা গিয়েছে 'মেহেবুবা' তেও। সেখানে শিবরঞ্জনি রাগের উপর গাওয়া কিশোর কুমারের 'মেরে নয়না শাওন ভাদো'র জনপ্রিয়তাও প্রশ্নাতীততভাবে লতার থেকে বেশি। আবার মঞ্জিল ছবিতে 'রিম ঝিম গিরে সাওন' কিশোর, লতা দুজনেই গেয়েছেন। যথারীতি তৃতীয় গাঙ্গুলি ওভার বাউন্ডারি মেরে দিয়েছে। একই কথা খাটে সওতন ছবির 'জিন্দেগি প্যার কা গীত হ্যায়' গানের ক্ষেত্রেও।

কিশোর কুমার টেক্কা দিয়েছিলেন আশা ভোসলেকেও। সেই আশা ছবিতে। 'ইনা মিনা ডিকা' গানে কিশোর কুমার পিছনে ফেলে দিয়েছিলেন আশা ভোঁসলেকে। আবার আন্দাজ ছবিতে 'জিন্দেগি এক সফর হ্যায় সুহানা' গানটির দশা ১৯৭৫ সালের শিল্ড ফাইনালের মতোই। কিশোর কুমার পাঁচ গোল চাপিয়ে দিয়েছিলেন আশাকে। আশার গলায় ইওর লিং সেদিন নিতান্তই বেমানান লেগেছিল। মুকাদ্দর কা সিকান্দর ছবির কথাই ধরা যাক। 'ও সাথীরে, তেরে বিনা ভি ক্যা জিনা' গানটি কিশোর-আশা দুজনেই গেয়েছেন ? আশার সেই গান কজন শুনেছেন ? বাংলা ছবি জীবন মরনে 'আমার এ কণ্ঠ ভরে' গানটিতেও আশা

এক্কেবারে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পী পারভিন সুলতানাকেও পরাজয়ের এমন তিক্ত স্বাদ পেতে হয়েছিল। কুদরত ছবিতে 'হামে তুমসে প্যার কিতনা' গানটি কিশোর ও পারভিন দুজনেই গেয়েছিলেন। পারভিন সুলতানার ক্লাসিকাল টাচ ইনিংস ডিফিট খেয়েছিল কিশোর কুমারের সাদামাটা গলার কাছে। এবার সেই মোক্ষম প্রশ্ন, কেন ? উত্তর অজানা। কেমন করে রবি ঠাকুর তাঁর প্রতিভার ফুল ফোটাতেন, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত জানতে চেয়েছিলেন সুকান্ত। আমরাও অশিক্ষিত গলার জনমনে এমন মনোপলির কারণ খুঁজে চলেছি। ষড়যন্ত্রের থেকে হৃদযন্ত্র বেশি গুরুত্ব পেত বলেই কি ? উত্তর জানা নেই। জিজ্ঞাসা চিহ্ন অবিনশ্বর।

# ১৬ বছরে লিখেছিলেন দাদার কীর্তি!

**রুদ্র ভৌমিক**

তাঁর কাহিনী নিয়ে একের পর এক ছবি তৈরি হয়েছে। মুম্বইয়ে নিজেও লিখেছেন একের পর এক চিত্রনাট্য। সেগুলো থেকে সেই সময়ের হিট হিন্দি ছবি তৈরি হয়েছে। কিন্তু নিজের ১৬ বছর বয়সে লেখা গল্প নিয়ে ছবি হতে পারে, কখনই ভাবেননি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

তখনও ব্যোমকেশের ভাবনা মাথাতেই আসেনি। আর ঐতিহাসিক উপন্যাস! সেগুলোও জন্ম নেয়নি। কলেজ জীবন থেকেই টুকটাক লেখালেখি। ওই ষোল বছর বয়সেই লিখেছিলেন প্রেমের প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু তখন বয়স অল্প। তাই সেই সময় প্রেমের গল্পটি কোথাও ছাপতে দেননি। পাছে বয়স্করা দেখে ফেলে!

পরে একের পর এক গল্প, উপন্যাস লেখা শুরু করলেন। সাহত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। বম্বেতে চিত্রনাট্যকার হিসেবেও বেশ খ্যাতি। কিন্তু ষোল বছর বয়সের ওই গল্পটা কোথাও কখনও ছাপতে দেননি। মনে হয়েছিল, ওটা নেহাতই কাঁচা হাতের লেখা। যে লোকটা ব্যোমকেশ লেখে, সেই লোকটার নামে এই লেখা মানাবে না। এভাবেই লেখাটা পড়ে রইল ড্রয়ারের মধ্যেই।

সামনে এল তাঁর মৃত্যুর পর। ১৯৭০ সালে পুনেতে থাকাকালীন হল সেরিব্রাল অ্যাটাক। আনা হল বম্বেতে। সেখানেই মৃত্যু। মৃত্যুর পর এই অপ্রকাশিত গল্পটি প্রকাশ পেল। যেটি সারাজীবন কাঁচা হাতের লেখা বলে কোথাও ছাপতে দিলেন না, সেটি প্রকাশ হতেই অন্য মোড় নিল। এগিয়ে এলেন তরুণ মজুমদার। ঠিক করলেন, এই গল্পটা নিয়েই সিনেমা বানাবেন। বললেন, এই গল্পের চিত্রসত্ব চাই। একটু একটু দাঁড় করালেন গল্পটাকে। তৈরি হল চিত্রনাট্য। গল্পের নামটা বদলে গেল। সেই ছবিই হয়ে উঠল ‘দাদার কীর্তি’।

# ছৌ মুখোশের চড়িদা গ্রামে একটি দিন

ছৌ নাচের কথা কে না জানেন! কোথায় তৈরি হয় সেই ছৌ–মুখোশ? অযোধ্যার লাগোয়া সেই চড়িদা গ্রাম থেকে ঘুরে এসে লিখলেন বুবুন ঘোষাল।

পুরুলিয়া বললেই সবার আগে কোন ছবিটা ভেসে ওঠে। যারা শিক্ষা অনুরাগী, তাঁরা হয়ত বলবেন, রামকৃষ্ণ মিশনের কথা। যাঁরা ঘুরতে ভালবাসেন, তাঁরা হয়ত বলবেন অযোধ্যা পাহাড়ের কথা। হ্যাঁ, এই দুটোর কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে গেছে, এমন কোনও বিষয়? এমন কোনও লোকসংস্কৃতি? আর ক্লু দেওয়ার দরকার নেই। ছৌ নাচের ছবিটা এতক্ষণে নিশ্চয় মনের মধ্যে ভেসে উঠেছে। হ্যাঁ, এই ছৌ নাচের কথা বললে, এককথায় ভেসে ওঠে পুরুলিয়া জেলার নাম।

কিন্তু এই ছৌ মুখোশ কোথায় তৈরি হয়? হঠাৎ করেই সেই গ্রামে যাওয়ার সুযোগটা এসে গেল। আমরা গিয়েছিলাম পর্বতারোহনের প্রশিক্ষণ শিবিরে। এত

কাছে এলাম। আর ছৌ গ্রাম চড়িদায় যাব না? বাঘমুন্ডি থেকে মাত্র আধ ঘণ্টার পথ। কয়েকটা বাইক নিয়ে, স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে নিয়ে আমরাও বেরিয়ে পড়লাম চড়িদার পথে। গ্রামটা যে খুব আহামরি, এমন নয়। দক্ষিণ বঙ্গের আর দশটা গ্রাম যেমন হয়ে থাকে, অনেকটা সেরকমই। ছোট্ট গ্রাম। গোটা তিরিশেক পরিবার। সব পরিবারই কোনও না কোনওভাবে এই ছৌ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এই গ্রামে যে মুখোশ তৈরি হয়, সেটাই পৌঁছে যায় দেশের নানা প্রান্তে, এমনকী বিদেশেও।

গ্রামের মানুষগুলি বেশ সাধাসিধে। মুখোশ বানালেও ওদের মুখে কোনও মুখোশ নেই। একটু কান পাতলেই ওদের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাবেন। বংশ পরম্পরায় চলছে ঠিকই। কিন্তু কতদিন এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন, ওঁরা নিজেরাও সংশয়ে। এক প্রবীণ শিল্পী বলছিলেন, আমাদের তৈরি মুখোশ বিদেশে মোটা দামে বিক্রি হয় শুনেছি। কিন্তু সেই টাকা তো আমাদের ঘরে আসে না। কাদের কাছে যায়, কে জানে!

মূলত কাগজ আর আঠা দিয়েই তৈরি হয় এই মুখোশ। গ্রামের ৪–৫ বছরের শিশু যেমন কাজ করছে, তেমনি ৮০ বছরের বয়স্ক মানুষটিও দিব্যি হাত লাগাচ্ছেন। বাড়ির মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। কেউ শুরুর দিকটা এগিয়ে দেয়। কেউ ফিনিশিংয়ে বেশি পারদর্শী। কারও হাতে রঙের কাজ দারুণ খেলে। কেউ কাগজ কেটে রাখে, কেউ আঠা তৈরি করে। সব ঘরেই কিছু না কিছু কাজ হচ্ছে। সব ধরনের মুখোশ যে সবাই বানাতে পারেন, এমন নয়। মূলত পৌরাণিক কাহিনির ওপর ভিত্তি করেই হয় ছৌ পালা। রামায়ন, মহাভারত, মহিষাশূরমর্দিনী এগুলোই বেশি জন-প্রিয়। এইসব পালার বিভিন্ন চরিত্রের আলাদা আলাদা মুখোশ।

এই মুখোশগুলো কি শুধু ছৌ শিল্পীদের

জন্য? মোটেই না। আপনি-আমিও কিনতে পারি। ছৌ নাচ নাচতে নাই বা পারলেন। বাড়িতে সাজিয়ে রাখতে তো আপত্তি নেই। শহুরে অনেক বাড়িতেই শোভাবর্ধন করে এই মুখোশ। যাঁরাই অযোধ্যা পাহাড়ের দিকে আসেন, তাঁদের অনেকেই ঘুরে যান এই গ্রাম থেকে। শীতের এই সময়টায় পরিযায়ী পাখিদের মতোই বিদেশিদের আনা-গোনাও লেগেই থাকে। বিদেশিরা আসার আগে নেট ঘেঁটে এ তল্লাটের নানা হেরিটেজের কথা আগেই জেনে আসেন। আর সেই হেরিটেজের তালিকায় চড়িদা গ্রাম তো আছেই। তাঁরাও এই গ্রামে আসেন, ছবি তোলেন, ভিডিও তোলেন। কত তথ্যচিত্র যে তৈরি হয়েছে, তার হিসেব কে রাখে! দেশি-বিদেশি কোন ম্যাগাজিনে কোন ছবি ছাপা হচ্ছে, তার হদিশও পাওয়া মুশকিল। এভাবেই খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

গ্রামে এসেই অনেকে মুখোশ নিয়ে যান। আবার শীতের সময় রাজ্যের নানা প্রান্তে মেলা বসে। সেখানেও ডাক পড়ে শিল্পীদের। সেইসব মেলায় বিক্রি হয় ভালই। কখনও এজেন্ট মারফত নানা জায়গায় যায়। অনলাইনে কেনার সুযোগ নেই ঠিকই, তবে ফোনে অর্ডার দেওয়াই যায়। ফ্লিপকার্ট বা অ্যামাজন কি চড়িদার কথা জানে! জানলে হয়ত বিপণনের নতুন দরজা খুলে যেত। আরও বেশি করে ছড়িয়ে পড়তে পারত।

অন্তরা চৌধুরি

# স্বপ্নে জড়ানো ছেলেবেলার চড়ুইভাতি

শীতকাল এলেই মনটা কেমন পিকনিক পিকনিক করে ওঠে। মনে হয় একছুটে চলে যাই কাছে-দূরে। কিন্তু পিকনিকের বদলে যদি বলা হয় চড়ুইভাতি, তাহলে অনেকের কাছেই ব্যাপারটা অচেনা ঠেকবে। কারণ চড়ুইভাতি বা বন ভোজন শব্দটার সঙ্গে আধুনিক প্রজন্ম তেমন পরিচিত নয়। এখনকার পিকনিক মানে তো কোনও বিশেষ জায়গায় দল বেঁধে বেড়াতে যাওয়া। খাওয়া দাওয়া নিয়ে নো টেনশন। তার জন্য ক্যাটারিং বা রান্নার ঠাকুর আছে।

থাকে রসনা পরিতৃপ্তির হরেকরকম আয়োজন। চিকেন পকোড়া থেকে বিরিয়ানি। ভাত বাঁধাকপির তরকারি মাং চাটনি-এসব সাবেকিয়ানার এখন নো এন্ট্রি। আর নিজেদের হাত পুড়িয়ে রান্নার করার তো কোনও গল্পই নেই। স্রেফ এনজয়মেন্ট।

কিন্তু এই পিকনিকে মজা কোথায়! এগুলো তো কর্পোরেট পিকনিক। নিজের হাতে রান্না না করলে কি আর পিকনিক জমে! বাঁধাকপিতে যদি একটু পোড়া গন্ধ না ছাড়ে, মাংসে যদি একটু বেশি নুন না হয় তাহলে আর পিকনিক হল কই! আমাদের ছোটবেলায় ছিল বনভোজন বা চড়ুইভাতি। আমরা যারা আশি নব্বইয়ের দশকে বেড়ে উঠেছি তারা ব্যাপারটা ভাল বুঝতে পারবেন। স্কুল বা টিউশনের বন্ধুরা মিলে মোটামুটি একটা কাছেপিঠে জায়গা ঠিক করে নেওয়া হত। সেই জায়গার তেমন কৌলীন্য না থাকলেও চলবে। কেবল একটু গাছপালা, পুকুর বা নদী আর নির্জনতা-এই ছিল ক্রাই-টেরিয়া। জিনিসপত্রের মোটামুটি একটা আন্দাজ দাম ধরে নিয়ে একটা নির্দিষ্ট চাঁদা তোলা হত। টিমে একজন বা দুজন ম্যানেজার গোছের থাকত। তারাই কেনাকাটার যাবতীয় দায়িত্ব সামলাতো। কোথায় ডিম, কোথায় কেক, তরি তরকারি, তেলমশলা ইত্যাদি।

গাড়ি ভাড়া করে যাওয়া তো দূরে থাক ভাবার সামর্থ্যটুকুও ছিল না। তাই প্রাণের চেয়ে প্রিয় সাইকেলই ছিল তখন একমাত্র ভরসা। সেই বিশেষ দিনটির আগমনের অপেক্ষায় দিন গুনতাম। মনের ভেতর উত্তেজনার চোরাস্রোত বইত। তবে চড়ুইভাতি করার আগে বাড়ির লোকের কাছে পারমিশন নিতে বোধহয় সকলেরই বুক কাঁপত। সারাদিন পড়াশোনা বন্ধ করে বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক করতে যাওয়া ব্যাপারটায় বড়রা অতটা প্রশ্রয় দিত না। তাই আগের দিনগুলোতে সারাদিন পড়ার বিনিময়ে একটা দিন ছুটির ছাড়পত্র মিলত অনেক কষ্ট করে। আগে থেকে সবাই ঠিক করে নিত কে কোন জিনিসপত্র নিয়ে যাবে। সেই অনুযায়ী সবকিছু সাইকেলের পেছনে বেঁধে আগের রাত্রির থেকে রেডি করে রাখতাম।

তারপর শুরু হত আমাদের চড়ুইভাতি অভিযানের পালা। তখন ফোন ছিল না। তাই আগের যে যার মতো ভোর-বেলায় উঠে আধো আলো আধো অন্ধ-কারে কুয়াশা ঢাকা রাস্তা ধরে ঠান্ডার মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম সেই অচিনপুরের উদ্দেশ্যে। সেই বিশেষ জায়গায় পৌঁছে দেখতাম দলের ম্যানেজার আগেই

হাজির হয়ে গেছে। এক এক করে সকলেই এসে জমা হল। হাঁড়ি কড়াই বনের ভেতরে রেখে আমরা বেরিয়ে পড়লাম খেজুর রসের উদ্দেশ্যে। সব দলেই গেছো টাইপের একজন থাকে। সে-ই তরতর করে গাছে উঠে পেড়ে আনল হাঁড়ি ভর্তি খেজুর রস। পৌষের ভোরে এমন সুশীতল পানীয়ের কোনও তুলনা হয় না। রস পর্ব খাওয়া মিটে গেলে আমরা আবার ফিরে এলাম সস্থানে।

তারপর শুরু হল অপটু হাতে আমাদের সেই বনভোজনের প্রস্তুতি। কোন ওরকমে তিনটে বড় সাইজের পাথর এনে উনুন তৈরি হল। দুজন গেল জঙ্গলে শুকনো পাতা আনতে। কাঠ জোগাড় করতে। তারপর চাপানো হল চা। একটু একটু করে সূর্যের আলো স্পষ্ট হচ্ছিল। সোনাঝুরি গাছের ফুল থেকে টুপ টুপ করে ঝরছে শিশির। সরষে ফুলের সুগন্ধে জড়ানো সে এক স্বর্গীয় ভোর। অবশেষে ধোঁয়ার গন্ধ মাখা চা তৈরি হল। তখন অত বাছবিচার ছিল না। নিজেরা করেছি সেটাই বড় ব্যাপার। সেই হি হি ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে সেই চা পান করা হল। সঙ্গে ছিল বাপুজি কেক আর বাড়ি থেকে আগের রাত্রে সেদ্ধ করে রাখা ডিম। তারপর স্টিলের গ্লাস নিয়ে একজন বসে গেল বাঁধাকপি কাটতে। একজন বসে গেল পেঁয়াজ রসুন আদা ছাড়াতে। অত ভোরে মুরগি পাওয়া যায়নি। তাই একটু বেলা গড়াতেই আমাদের ম্যানেজার চলে গেল মুরগি কিনতে পাশের গ্রামে। প্রস্তুতি তো মোটামুটি হল। কিন্তু আদা পেঁয়াজ রসুন যে বেটে পরে মাংসে দিতে হয় সেকথা কারওরই খেয়াল ছিল না। কিন্তু তখন তো কিছু করার নেই। অবশেষে পাথরে পাথরে কোনও রকমে আধছেঁচা করা হল। ওদিকে তখন বেলা গড়িয়ে প্রায় দশটা বেজে গেছে।

জলখাবারে ছিল মুড়ি। আমাদের ম্যানেজার আসার সময় চপ নিয়ে এসেছিল। সামনের ক্ষেত থেকে তুলে আনা হল

টাটকা টমেটো। সেই সব মিশিয়ে বেশ জমিয়ে খাওয়া হল মুড়ি। সামনেই ছিল নদী। বালি সরিয়ে চুঁয়া খুঁড়ে জল খাওয়া হল সে যে কী আনন্দ বলে বোঝানোর নয়। জীবনে সেই প্রথম স্বাধীনতার স্বাদ বেশ চেটেপুটে সকলেই বেশ উপভোগ করেছিল।

রান্নায় কেউই তেমন পারদর্শী না হলেও মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল। কারণ আমরা তখন এখনকার বাচ্ছাদের মত এত প্যাম্পারড ছিলাম না। তাই টুকটাক রান্না কাজকর্ম আমরা সেই বয়সেও শিখে গিয়েছিলাম। দুপুর আড়াইটে নাগাদ মোটামুটি সব খাবার তৈরি হয়ে গিয়েছিল। খুব যে খারাপ হয়েছিল তা বলা যাবে না। বরং প্রয়োজনের তুলনায় কিছু ভালোই হয়েছিল। গাছ থেকে টাটকা শাল পাতা পেড়ে থালা তৈরি করা হল। আমরাও নদীর জলে স্নানটান সেরে সবাই রেডি। বনভোজনের নিয়ম হল সব খাবার একটু একটু করে নিয়ে থালায় সাজিয়ে আগে বনবুড়িকে দিয়ে আসতে হয়। আমরাও সেইমতো সমস্ত খাবার সাজিয়ে বনের এক জায়গায় বন-বুড়িকে দিয়ে এলাম। তারপর আমাদের খাওয়ার পালা। সকলেই বেশ কব্জি ডুবিয়ে ভরপেট খেলো। মাংসটা ওই আধছেঁচা মশলা দেওয়ার ফলে বেশ অসাধারণ হয়েছিল।

খাওয়া দাওয়ার পর্ব চুকিয়ে আমরা নদীর ধার, সরষে ক্ষেত ফাঁকা হয়ে যাওয়া ধানজমিতে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াই। কচি কাঁচা কিশোর কিশোরীদের কলতানে ভরে ওঠে সেই মৌন প্রকৃতি। তখন সেলফি ছিল না। তাই ছবি নেই। মনের ক্যামেরাতেই সেই ছবি আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। ইচ্ছে ছিল প্রত্যেক বছর এমন চড়ুইভাতি করব। কিন্তু জীবনের দাবি সবার থেকে বেশি। তাই ওইরকম বনভোজন আর কখনও করা হয়নি। উঠতি বয়সে হয়তো অনেক পিকনিক করেছি। কিন্তু সেখানে সেই সারল্য ছিল না। তাই আজও ফিরে পেতে ইচ্ছে করে সেই ফেলে আসা দিন। হয়তো সেই অচিনপুরে নাম না জানা নদীর ধারে সরষে ক্ষেতের পাশে আজও পড়ে আছে আমাদের সেই ফেলে আসা কিশোরীবেলা।

# গ্রিন টি! মোটেই সুস্বাদু নয়, তবু খান

বেঙ্গল টাইমস প্রতিবেদন: জল ছাড়া কোন তরল আমরা সবথেকে বেশি পান করে থাকি? যাঁরা সুরাপায়ী, তাঁদের কথা আলাদা। গড়পড়তা মানুষ বেশ কয়েক কাপ চা খেয়ে থাকেন। অনেকে হয়ত বারণ করেন। এই বারণ না শুনলেও চলবে। দিনে বেশ কয়েকবার চা চলতেই পারে। বিশেষ করে যাঁদের সুগার আছে, তাঁরা নিয়মিত চা পান করুন।

১) তবে মোটেই দুধ চা নয়। এতে স্বাদ হয়ত পাবেন। কিন্তু সুগার তাড়ানোর কাজে লাগবে না। সবসময় লাল চা। তৃণমূল বা বিজেপি হলেও লাল চায়ে নিশ্চয় আপত্তি নেই!

২) চিনি না থাকলে সবথেকে ভাল। থাকলেও অল্প। নইলে সুগার কমাতে গিয়ে আরও সুগার ডেকে আনবেন।

৩) সাধারণভাবে কার্বোহাইড্রেড জাতীয় খাবার খেলে রক্তে চিনির মাত্রা বৃদ্ধি পায়। চা তা ঠেকিয়ে দিতে পারে।

৪) যদি নিয়ম করে গ্রিন টি খেতে পারেন, তাহলে আরও নানা উপকার পাবেন। যাঁদের মেদ ও কোলেস্টেরল আছে, তাঁরা গ্রিন টি চেষ্টা করে দেখতে পারেন। দাম বেশি, খেতেও তেমন ভাল লাগবে না। ওষুধ মনে করেই খেয়ে ফেলুন।

## স্মৃতিটুকু থাক

# সেই মাধবকাকুরা হারিয়ে যাচ্ছে

আমার জন্ম, বেড়ে ওঠা মেদিনীপুরের এক মফস্সলে। আমাদের এলাকায় একজন পিওন এসেছিলেন। আমরা তাঁকে মাধবকাকু বলতাম। মাত্র কয়েক-দিনেই সবাইকে দিব্যি চিনে নিয়েছিলেন। কার কাছে কী ধরনের চিঠি আসে, কোন চিঠি কাকে দিতে হয়, ঠিক জানতেন।

একবার আমাকে খুব বড় একটা বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। এক বিয়ে-বাড়িতে একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কিন্তু সে যে এভাবে চিঠি লিখে ফেলবে, কে জানত! প্রেম নিবেদন করে মস্ত এক চিঠি পাঠিয়েছিল। ওই চিঠি যদি বাবার হাতে যেত, নির্ঘাত বকুনি জুটত।

মাধবকাকু সেই চিঠি বাবার হাতে দেননি। আমাকে দেখতে পেয়ে একদিন ডাকলেন। বললেন, ‘তিন দিন ধরে তোমাকে খুঁজছি। ইচ্ছে করেই বাড়িতে দিইনি। কোনও ভয় নেই। তোমার চিঠি আমি তোমাকেই দেব।’

এখন লোকে চিঠি লিখতেই ভুলে গেছে। মাধবকাকুদের মতো চরিত্ররাও বোধহয় হারিয়ে গেছে।

**পিয়ালি সেনগুপ্ত, ভদ্রেশ্বর**

(এই বিভাগ কিন্তু একান্তই পাঠকদের জন্য। আপনারাও লিখে পাঠান আপনাদের অনুভূতি। বিশেষ কারও কথা মনে পড়ছে? অতীতের কোনও কাজের জন্য ভুলস্বীকার করতে ইচ্ছে করছে? বলে ফেলুন। দেখুন, অনেক হালকা লাগবে। লেখা পাঠানোর ঠিকানা: bengaltimes.in@gmail.com)

স্বীকারোক্তি

# স্কুল ম্যাগাজিনে না দেওয়া সেই লেখা

ছোট ছোট ভুল অনেক সময় বারবার মনে পড়ে যায়। অনেক বছর পেরিয়ে গেলেও ভোলা যায় না। তেমনই একটি ভুলের কথা বলে হয়ত কিছুটা হালকা হতে পারব। তখন বোধ হয় ক্লাস নাইনে পড়ি। ক্লাসে নোটিশ দেওয়া হল, স্কুল ম্যাগাজিন বেরোবে। যারা যারা লেখা দিতে চায়, তাদের সাত দিনের মধ্যে লেখা দিতে হবে।

আমি বোধহয় সেই বিরল বাঙালিদের একজন, যে সারা জীবন একটিও কবিতা লেখেনি। তাই আমার লেখা দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু আমার বন্ধু দেবরাজ আমাকে একটি কবিতা দিয়েছিল। সে জ্বরের জন্য কয়েকদিন স্কুলে যেতে পারেনি। এক বন্ধুর কাছে লেখা দেওয়ার কথা শুনেছিল। দেবরাজ আমাকে বলল, তুই তো স্কুলে যাচ্ছিস। এই লেখাটা বাংলার স্যারকে দিয়ে দিস। আমি যথারীতি লেখাটা দিতে ভুলে গেলাম। তিনদিন পর মনে পড়ল। তখন আর লেখাটা খুঁজেও পেলাম না। কী জানি, কোথায় হারিয়ে ফেলেছি। দেবরাজ লেখাটার ব্যাপারে আমাকে আর জিজ্ঞাসাও করেনি।

ম্যাগাজিন বেরোলো। তাতে দেবরাজের লেখা নেই। থাকার কথাও ছিল না। দেবরাজ ভেবেছিল, ওর লেখা হয়ত স্যারের ভাল লাগেনি। তাই ছাপা হয়নি। হয়ত মনে মনে স্যারের প্রতি রাগও হয়েছিল। কিন্তু আমি যে লেখাটা জমাই দিইনি, সেটা ওকে জানাতেও পারিনি। সেই ভুলের বোঝা আজও বয়ে বেড়াচ্ছি। দেবরাজ, সেদিনের সেই ভুলের কথা এতদিন পর তোর কাছে স্বীকার করছি। ওটাকে ভুল হিসেবেই দেখিস। বিশ্বাস কর, সেই ভুলটা ইচ্ছাকৃত ছিল না।

সজল চক্রবর্তী,
কৃষ্ণনগর, নদীয়া

(স্মৃতিটুকু থাক। পাঠকের মুক্তমঞ্চ। এখানে ফেলে আসা জীবনের অনেক স্মৃতি উজাড় করে দিতে পারেন। অনেকদিনের লুকিয়ে রাখা কোনও ভুল স্বীকার করে নিজের মনকে কিছুটা হালকাও করতে পারেন। লিখে পাঠানা আপনার অনুভূতির কথা)

# দায় শুধু বিরাটদের নয়, বোর্ডেরও

## সোহম সেন

বিরাট কোহলি টানা তের বছর ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেননি! রোহিত শর্মাও প্রায় এক দশক ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেননি! এঁরা কি এতটাই বড় তারকা হয়ে গেছেন! শুধু এঁদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। বোর্ডও এঁদের তোল্লাই দিয়ে দিয়ে এই জায়গায় এনেছে। এঁরা ধরেই নিয়েছেন, না খেললেও বোর্ড এঁদের কিছুই করতে পারবে না।

মাস খানেক আগে বোর্ড ইশান কিষাণ আর শ্রেয়স আয়ারকে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলার নির্দেশ দিয়েছিল। এ অনেকটা ঝিকে শাসন করে বউকে শিক্ষা দেওয়ার মতো। কিন্তু তাতে কোনও কাজই হয়নি। ইশান, শ্রেয়স হয়তো রনজিতে খেলেছেন। কিন্তু তারকা ক্রিকেটাররা ঘরোয়া ক্রিকেটের দিকে ফিরেও তাকাননি।

গাভাসকার, কপিলদেবদের দেখা যেত, তাঁরা রনজি ট্রফিতে জিততে কতটা মরিয়া থাকতেন। ভারতের হয়ে লম্বা সিরিজ খেলার পরের দিনই রনজি ফাইনাল খেলতে এক শহর থেকে অন্য শহরে উড়ে গেছেন শচীন তেন্ডুলকার, সৌরভ গাঙ্গুলিরা। সেবার রনজি ফাইনাল ছিল বাংলা-মুম্বইয়ের। একদিন আগেও যাঁরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভারতকে জিতিয়েছেন, তাঁরাই কিনা রনজি ফাইনালে নেমে পড়ছেন একে অন্যের বিপক্ষে। এবং দায়সারা ব্যাটিং করেছিলেন, এমনও নয়। শচীন যেমন দুরন্ত শতরান করেছিলেন, সৌরভও পৌঁছে গিয়েছিলেন শতরানের দোরগোড়ায়। আবার সেই রনজি ফাইনালের পরদিনই আবার যোগ দিয়েছিলেন জাতীয় শিবিরে। আবার একসঙ্গে নেমেছিলেন দেশের হয়ে খেলতে।

শচীন-সৌরভরা কি তারকা ছিলেন না? শচীন-সৌরভরা নিয়মিত রনজি ট্রফি, দলীপ ট্রফি, দেওধর ট্রফিতে খেলতে পারেন। বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মারা পারেন না? নতুন একটা শব্দের আমদানি হয়েছে— ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট। এসব শব্দ আগে কখনও শুনিনি, এই গত কয়েক বছরে বেশি করে শুনছি। মোদ্দা কথা, আইপিএলে খেলো। দেশের হয়ে খেলার সময় যত রকমের বায়না। আর ঘরোয়া ক্রিকেট হলে তো কথাই নেই। সেখানে খেলার কোনও দরকারই নেই। আচ্ছা, টি২০ বিশ্বকাপের পর বিরাট-রোহিতরা দেশের হয়ে কদিন খেলেছেন? জুলাই, আগস্ট এই দুমাসে মেরেকেটে সাতদিন। তারপরেও এঁরা দলীপ ট্রফি বা ইরানি কাপে খেললেন না!

ঘরোয়া ক্রিকেটকে উপেক্ষা করার যে প্রবণতা শুরু হয়েছে, তার ফল আমরা এই সিরিজে পেলাম। নিজেদের পছন্দের স্পিনের উইকেট। তাতেও কী করুণ পরিণতি! ঘরোয়া ক্রিকেটে খেললে, কিছুটা ম্যাচ প্র্যাকটিস পেলে, অন্তত এমন করুণ পরিণতি হত না। সামনেই অস্ট্রেলিয়া সিরিজ। সেখানে পৌঁছেও ভারত নাকি কোনও প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে না। নেটেই নাকি প্রস্তুতি হয়ে যাবে। এটা আরও এক আত্মহননকারী সিদ্ধান্ত। শুধু জিমের ফিটনেস, আর নেট প্র্যাকটিস দিয়ে টেস্ট ক্রিকেট হয় না। এই সত্যিটা না বোঝেন ক্রিকেটাররা, না বোঝেন বোর্ডকর্তারা।

ভ্রমণ

# পলাতক হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা

শান্তনু দেশাই

ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে ঝমঝম করে একটা ব্রিজ পেরোলো ট্রেনটা। নদীর নাম দেখলাম ডায়না। ভারী সুন্দর তার গড়ন। জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাঁ গো তুমি বিদেশি নাকি? কলকলিয়ে হেসে বললো কেন গো? নদীর আবার দেশ বিদেশ হয় নাকি?

আমাদের তো সারা বিশ্ব এক দেশ। সকলেই আমরা কারো না কারোর সঙ্গে জড়িয়ে আছি। তোমরা নিজেদের মত করে ভাগ করে নিয়েছ।

লজ্জায় পড়ে গেলাম। সত্যি তো আমরাই বিশ্বকে বিভাজিত করেছি।

ট্রেনটা দাঁড়িয়ে গেল কিছুক্ষণ। ভালোই হোল। আমি ডায়নার সাথে বেশ কিছুক্ষণ গল্প করার সুযোগ পেলাম। ডায়না, তিস্তা, তোর্ষার খোঁজ নিল। আমাকে সুধালো কোথায় যাচ্ছি।

বললাম কোথাও নয় গো। এমনি অলস ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ডায়না বললো, ও, পলাতক ছবির রেশ নাকি !

নাঃ, সে আর পারি কই।

ট্রেন হুইসেল বাজিয়ে দুলে উঠল। ডায়না কে বিদায় জানিয়ে এগিয়ে চললাম। জানালার বাইরে সরে সরে যাচ্ছে দৃশ্যপট। আমার কল্প জগৎ সারাক্ষণ অনুরিত হচ্ছে সেই চলমান দৃশ্যের।

আমি একটু বেশিই কল্পনা প্রবণ।

কৈশোর বয়সেও সাহিত্য পরীক্ষায় বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ, নিয়মানুবর্তিতা, বা

কোনও মনীষীদের অবদান রচনা ছেড়ে আমি একদম শেষে থাকা একটি বট গাছের আত্মকথা বা একটি নদীর আত্মকথা লিখতে পছন্দ করতাম।

কলেজে নীরস লেকচারের ফাঁকে খোলা জানালা দিয়ে বাইরের ঘুরপাক খেয়ে ওঠা ধোঁয়ার কুন্ডলী দেখে বিভোর হয়ে যেতাম। সেই কল্পনার কলতান ইদানিং একটু কমেছে সাংসারিক চাপের কারণে। মনের চাতালে শ্যাওলা জমেছে।

তবু আজও সুযোগ পেলেই মন উড়ি উড়ি। ট্রেনের আরামপ্রদ চেয়ারে প্রায় সকলেই মুঠো ফোনে মগ্ন। জানি না কি দেখেন, শোনেন। ট্রেনের জানালার বাইরে তখন একটা ছোট্ট গ্রাম। অনেক সুপারি গাছ, দরমার বেড়া দেয়া গোয়ালঘর। টিনের চালা দেয়া দু কামরার ঘর থেকে ধোঁয়া উঠছে। হয়তো কেউ কাচি মাছের বাটি চচ্চড়ি বসিয়েছে। ঝাল ঝাল কুল লঙ্কা দিয়ে সে বড় লোভনীয়।

বেশ কদিন ধরেই এদিকে তুমুল বৃষ্টি হয়েছে। খাল বিল গুলো ভর ভর। তাতে কয়েকজন বাঁশের ঘনি দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টায়। আনারস ক্ষেতে জল ঢুকেছে। একটা মন্দির জেগে আছে। তার চাতালে দুইজন বসে।

ভাবি ওরা কি নিয়ে কথা বলছে।

ডবল ডোজ, বুস্টার, নিউ ভ্যারিয়েন্ট এইসব শব্দ কি ওদের জানা?

সেভক স্টেশন এ বিরাট কর্মযজ্ঞ চলছে। আমাদের শহুরে স্বাচ্ছন্দের বলি কয়েক হাজার গাছ।

শুধুই কি গাছ? তাতে থাকা কত পতঙ্গ, পাখি ? ওরা কোথায় যাবে ?

কতদিন জোনাকি দেখিনা।

রাঙারুনে হোম স্টের বারান্দায় বসে দূরে আলোকমালায় সজ্জিত দার্জিলিং শহরকে দেখে জোনাকি দেখার স্বাদ মেটাই।

আমরা খুব হিংস্র।

ভাবনায় ছেদ পড়ে হকারের ঝালমুড়ির আওয়াজে। কি সুন্দর সাজানো।

কিন্তু আমি যে সব কিছু সাজানো পছন্দ করিনা। একটু অগোছালো থাকাও ভালো। সাজানোর সুযোগ থাকবে তো।

এই দেখোনা সাজানো কাশ্মীর ভ্রমণ করতে গিয়ে মনটা একদম অগোছালো হয়ে গেল। হৈ হট্টগোল, দৌড়াদৌড়ি করে বেহাল। অশান্ত মনকে শান্তি দিতে তিনদিনের ছুটিতে চলে এলাম বর্ষার দার্জিলিংয়ে।

কোনও তাড়াহুড়ো নেই, কোলাহল নেই। টিপটিপ বৃষ্টিতে ছাতা মাথায় অলসভাবে লেবঙ কার্ট রোড, ভুটিয়া বস্তি, মহাকাল মন্দির ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

চাইনি তবু সে দেখা দিল।

গুনগুন করে গান শোনালাম... আমি আপন করিয়া চাহিনি তোমারে, তুমি তো আপন হয়েছো।

লাজুক হেসে মেঘের চাদরে ঘোমটা দিল। এই বেশ।

রোহিনীর রাস্তা ধরে শেয়ার জিপে যখন আসছিলাম তখনই চোখে সবুজের আস্ত-রণ ঘন হয়ে লেপ্টে গিয়েছিল।

জোড় বাংলো নেমে উল্টোদিকের রাস্তা ধরে তিন মাইল এসে যখন রাঙ্গারুন এর রাস্তা ধরলাম সে সবুজ আপ্লুত করে দিল।

কোথাও ঈষৎ হলুদাভ, কোথাও গাড় সবুজের শেড। জনমনিষ্যির চিহ্ন মাত্র নেই সারা রাস্তা জুড়ে।

ট্রেকার্স হাট, খালিঙ্গ হোম স্টে পেরিয়ে আশ্রয় নিলাম নিলম হোম স্টে তে।

ছোট্ট ছিমছাম ঘর বারান্দা। রাঙারুন এর চা বাগান এই অঞ্চলের সবথেকে প্রাচীন। দুঃখের বিষয় চা কারখানা টি বন্ধ। পূর্বের শ্রমিকরা কেউ দূরের বাগানে কাজ নিয়েছে, কেউ ঘরের সামনে দোকান করে দিন গুজরান করে।

পায়ে হেঁটে ঘুরতে বেশ লাগছিল।

কিছুটা দূরেই লাকপা হোম স্টে। সবথেকে সেরা লোকেশন। ঘর থেকেই চা বাগান সহ টাইগার হিল, দার্জিলিং শহর দৃশ্যমান। গাঁয়ের নীচে নদী। অন্য সময় জল থাকেনা। নদী পেরিয়ে পাহাড় চড়ে টি এন রোড ধরে দার্জিলিং যাওয়া যায়।

আমার সে আশায় জল ঢেলে দিল নদী। জল বিপদজনক ভাবে বয়ে চলেছে। পারাপার মুশকিল।

পরদিন রাঙারুন কে বিদায় জানিয়ে চলে এসেছিলাম দার্জিলিং।

আস্তাবল পেরিয়ে ম্যাল থেকে একশ মিটার দূরে সস্তার হোটেলে এক রাত কাটিয়ে নেমে গিয়েছিলাম শিলিগুড়ি।

ভবঘুরের মত ইচ্ছে নিয়ে কোনও গন্তব্য রাখলাম না। সকালের ট্রেন ধরে ডুয়ার্সের ঘন সবুজ গায়ে মেখে, চোখে লেপটে পৌছেছিলাম আলিপুরদুয়ার।

খানিক বিশ্রাম আর দুপুরের ভোজন সেরে ফিরতি পথে ডুয়ার্স রানী কাঞ্চন কন্যা ধরে বাড়ির পথে পা বাড়ানো।

রাজাভাতখাওয়া স্টেশন এর পাশে নুড়ি পাথরের খাঁজে অনেক অনেক প্রজাপতি উড়ছে, বসছে  ঘুরছে। কিতাবি ভাষায় মাড পুডলিং বলে।

ওরা ডাক দিল, আসবে না?

বললাম, আসবো আর একদিন,

আজ যাই।

# পাহাড় যেন দু'হাত উজাড় করে সবকিছু ফিরিয়ে দিল

## শান্তনু পাঁজা

আজ শোনাব একটু অন্য রকম গল্প। না চাইতেও অনেক কিছু পাওয়ার গল্প। সেটা এপ্রিলের ১১ তারিখ। চাকরিটা ছাড়ব ছাড়ব করে ছেড়েই দিয়েছিলাম ওই দিন। সেদিনই ঠিক করি ৩ মাস নোটিশ পিরিয়ড সার্ভ করার পর পাহাড়ে যাব। হিমালয়ের বর্ষা দেখব কিছুদিন, কোনও এক নির্জন গ্রামে বসে। ফেরার কোনও তাড়া থাকবে না। যেদিন ইচ্ছে হবে, সেদিন বাড়ি ফিরব।

আমার দুই বন্ধুকে ফোন করলাম। চাকরি সূত্রে আলাদা আলাদা জায়গায় থাকলেও একমাত্র ওরাই আছে আমার পাগলামির সাথে সাথ দেওয়ার জন্য। যেমনটা ভেবেছিলাম। ওদেরকে জানাতেই এক কথায় রাজি দুজনেই। দার্জিলিং মেলে জুলাই মাসের টিকিট কেটে নিলাম সঙ্গে সঙ্গে। ১০ তারিখ যাব, শুধু এটুকুই ঠিক ছিল। কোথায় যাব, কদিন থাকব, কিছুই ঠিক করে যাইনি। তাই ফেরার টিকিটটা ইচ্ছে করেই কাটলাম না।

সবাই বলেছিল, বর্ষাকালে পাহাড়ে যাচ্ছিস, তোদের ঘুরতে যাওয়া মাটি হবে। তাছাড়া ওই সময়টা বেশ বিপজ্জনক। জুলাই মাসে ভরা বর্ষাকাল। যখন তখন ধস নামতে পারে। রাস্তায়

আটকেও পড়তে পারি। এইসব নানা উপদেশ, পরামর্শ আসছিল নানা দিক থেকে। কিন্তু আমি তো ভেবেই নিয়েছি, যা হয় দেখা যাবে। এরপর ৩ মাসের নোটিশ পিরিয়ড ধীরে ধীরে গড়াতে লাগল। ভেবেছিলাম, ৩মাসের মধ্যে কলকাতার কোনও না কোনও MNC থেকে তো চাকরির অফার পেয়েই যাব। কারণ এখন আইটি-তে চাহিদা ভালই। কিন্ত মানুষ ভাবে এক, আর হয় এক। ৩ মাসের মধ্যে কলকাতার কোনও কোম্পানি থেকেই ভাল অফার পেলাম না। যেটা পেলাম, সেটা বেঙ্গালুরুতে। যাই হোক, ভাবলাম ছুটি কাটিয়ে ওখানেই জয়েন করব। যদিও মনের মধ্যে শান্তি ছিল না, ভাবছিলাম এতদিনের কলকাতা ছাড়তে হবে, বন্ধুদেরকে আর আগের মতো পাব না, এইসব।

যাই হোক, আসল কথায় আসি। ১০ জুলাই সব কাজ সাঙ্গ করে করে ৩ বন্ধু দার্জিলিং মেলে উঠে পড়লাম। ট্রেন ছুটল নিজের মতোই। আমার মনে শান্তি নেই, রাতে একটুও ঘুম এল না। সকাল সাড়ে আটটায় নামলাম সেই প্রিয় স্টেশন নিউ জলপাইগুড়ি, যেখানে নামলেই মন ভাল হয়ে যায়। কিন্তু এবার পরিস্থিতি অন্যরকম ছিল। মনের মধ্যে দুশ্চিন্তাটা থেকেই গেছে। কিছুতেই যেন তাড়াতে পারছি না। যাই হোক, দর দাম করে একটা ছোট গাড়ি বুক করে চললাম রামধুরার পথে। রামধুরা হল কালিংপং জেলার ছোট্ট একটা জনপদ, যেখানকার নৈশব্দ নাকি কানে বাজে। আমার চেনা একজন জায়গাটার সন্ধান দিয়েছিলেন। কোন হোম স্টে-তে থাকা যায়, সেটাও বলে দিয়েছিলেন। আর সাত পাঁচ না ভেবে সেখানেই বুকিং করেছিলাম।

এনজেপি থেকে গাড়িতে উঠে শালুগাড়ার জঙ্গল পেরোতেই একটা ফোন পেলাম। 'আমি কি শান্তনুর সঙ্গে কথা বলছি? একটা জব অপর্চুনিটির জন্য কল করছি। আপনি কি আজকে ৪টের সময় ইন্টারভিউ দিতে পারবেন?' আমি সাত পাঁচ না ভেবে বললাম, 'হাঁ পারব।' ফোনটা এসেছিল একটা খুবই বড় কোম্পানি থেকে, তাও আবার কলকাতায়। রাস্তায় পাহাড়ি রেস্তোরাঁয় বসে অসম্ভব সুস্বাদু মোমো আর থুকপা দিয়ে ব্রেকফাস্ট করলাম। পেটের খিদে তো মিটল। কিন্তু অন্য বারের মতো কেন জানিনা সফরটা কিছুইতেই বন্ধুদের সঙ্গে উপভোগ করতে পারছিলাম না। মনের মধ্যে শুধু ঘুরছে, ইন্টারভিউটা দিতে পারব তো! হ্যাঁ তো বলে দিলাম। কিন্তু প্রযুক্তিগত সমস্যা দেখা দেবে না তো? শুনেছি, ওখানে নেটওয়ার্ক খুব একটা ভাল না। যত রামধুরার কাছাকাছি যাচ্ছিলাম ততবার বার ফোনটা দেখছিলাম, নেটওয়ার্ক আছে তো! আছে তো!

অবশেষে যখন হোম স্টের সামনে নামলাম, দেখলাম নেটওয়ার্ক ঠিকঠাক। মন বলছিল, এবার সত্যিই হয়তো কপালে অন্য কিছুই আছে। সত্যিই তাই হল। রুমের সামনে ব্যালকনিতে পা রাখতেই যা দেখলাম, সেটা এই ভরা বর্ষাকালে আমরা কেউ আশা করিনি। দিগন্ত জোড়া পাহাড়, মেঘে ভরা সবুজ উপত্যকা। এক মুহূর্তে সব দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল। আমি একটু একটু করে যেন হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছিলাম।

অবশেষে স্নান করে, কুনসং হোম স্টের দিদির হাতের অসম্ভব সুন্দর খাবার খেয়ে চাঙ্গা হলাম। তারপর এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। মানে, বিকেল ৪টে। বন্ধুদেরকে বারান্দায় বসতে বলে, রুম করে বসলাম স্মার্ট ফোন থেকে ইন্টারভিউ দিতে। পুরো ইন্টারভিউটার সময় নেটওয়ার্ক ভালই ছিল, ইন্টারভিউটা হলও খুব ভাল। তারপর একটু মনের বোঝাটা নামতেই, ক্লান্ত শরীরটা বিছানায় ছাড়তেই ঘুমের দেশে।

বড়োজোর ১ ঘন্টা ঘুমিয়েছি। অমনি ফোনটা বেজে উঠেছে। বিরক্ত হয়ে তুললাম। তারপর? ওই যে শুরুতেই বলে-ছিলাম, না চাইতেই অনেক কিছু পাওয়ার গল্প। ফোনের ওপার থেকে এক মহিলা বললেন, 'শান্তনু, you have cleared the technical interview, HR will talk to you for the offer in 30 minutes'। মোদ্দা কথা, আমার একটা ইন্টারভিউ ক্লিয়ার হয়ে গেছে। আরেকটা দিতে হবে। তাড়াহুড়ো করে মুখে চোখে জল দিয়ে আবার বসলাম ইন্টারভিউ দিতে। এবার আর নেটওওয়ার্ক সহায় হল না। অনেকবার কল কেটে গেল, টেকনিক্যাল গোলযোগ হল। অবশেষে, ৩০ মিনিটের ইন্টারভিউ ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে শেষ হল, আর এবারেও আমি গোল দিলাম। এইচ আর সেকশন কনফার্ম করল যে, জব অফারটা আমি পাচ্ছি ২ দিনের মধ্যে। আমার তখন খুশি আর ধরে না। বন্ধুদের সঙ্গে সব খুশি ভাগ করে নিলাম। ওরাও আমার জন্য বেজায় খুশি। রাতে পাহাড়ি দেশি মুরগির ঝোল আর ভাত খেয়ে যেন তিন মাসের ঘুম সারলাম।

সকালে যখন সাড়ে চারটেয় ঘুম ভাঙল, তখন আরেক চমক। জানালা খুলতেই দেখলাম মেঘের আড়ালে সোনায় রাঙা কাঞ্চনজঙ্ঘা স্বমহিমায় বিরাজমান।

আবারও সেই একই, না চাইতেও অনেক কিছু পাওয়া। আমি কোনওদিন আশা করিনি এই বর্ষার মরসুমে ওই মায়াময় রূপ দেখব। আগে বহুবার দেখেছি, অনেক কাছ থেকে দেখেছি, কিন্তু এবারের মতো কখনও না। তারপর আর কি বারান্দায় বসে ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়েই কাটালাম তিন জনে। এরপর যতগুলো দিন ছিলাম, প্রতি দিন আমার প্রিয় পর্বত দেখা দিয়েছেন, কোনওদিন নিরাশ করেননি।

এত কিছু পাওয়ার পরেও একটা চিন্তা থেকেই গেল। ওই MNC আমাকে দুই দিনের মধ্যে অফার পাঠাবে বলেছিল। কিন্তু ৪দিন পরেও যখন কিছু এল না, তখন খুবই অস্থির লাগছিল। প্রকৃতি তার সমস্ত সৌন্দর্য উজাড় করে দিলেও আমি ভাবলাম শেষটা হয়তো ভাল হবে না। অবশেষে ফিরব ঠিক করে তৎকাল টিকিট কাটলাম ৫দিন পর। অনেকখানি ভাল লাগা, মন খারাপ আর দুশ্চিন্তা নিয়ে সমতলে নামলাম। নিউ জলপাইগুড়িতে রাত ৮টার দার্জিলিং মেলে উঠলাম। কিষানগঞ্জ পেরোতে না পেরোতেই ফোনে একটা নোটিফিকেশন এল। তাড়াহুড়ো করে মেলবক্স খুললাম। সত্যিই এই যাত্রায় পাহাড় দু'হাত ভরে সব দিল আমাকে। চিঠিতে লেখা ছিল "congratulations on your offer from....."। যাওয়ার দিনেও উৎকণ্ঠায় ঘুম হয়নি, আজও আর ঘুম হবে বলে মনে হচ্ছে না।

## ভিন্ন স্বাদের ভ্রমণ

শীত বা গ্রীষ্ম, বর্ষা বা বসন্ত, প্রায় সব ঋতুতেই বাঙালির মন উড়ু উড়ু। নদী, পাহাড়, সমুদ্র, জঙ্গল— সে কোথাও না কোথাও বেরিয়ে পড়তে চায়। বেরিয়ে পড়েও। সবার ঝুলিতেই বেড়ানোর অনেক গল্প জমে থাকে। ভাল লাগা, মন্দ লাগা— নানা অনুভূতি সে ভাগ করে নিতে চায়। কেউ ম্যাগাজিনে লেখে, কেউ ফেসবুকে লিখেই তৃপ্ত হয়। কেউ অনেককিছু লিখব ভাবে, কিন্তু লেখা আর হয়ে ওঠে না।

আপনার বেড়ানোর সেই ডায়েরি যদি বেঙ্গল টাইমসে উঠে আসে, কেমন হয়! লিখে ফেলুন আপনার অভিজ্ঞতার কথা। 'কীভাবে যাবেন, কোথায় থাকবেন মার্কা' টিপিক্যাল ছকে বাঁধা ভ্রমণ কাহিনী নয়। আপনি লিখুন আপনার মতো করেই। কোনও ফর্মুলা মেনে নয়, যা লিখতে ইচ্ছে করছে, আপনি সেটাই লিখবেন। বেড়ানো মানে পুরো সফরের বর্ণনা নয়। টুকরো টুকরো কত মুহূর্ত, কত মানুষ, যা খুশি লিখতে পারেন। নমুনা দেখতে হলে একবার বেঙ্গল টাইমসের ভ্রমণ বিভাগে উকি মারতে পারেন। এমন নানা লেখা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

অনেকেই লেখালেখির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন। তাই অনেকের মধ্যেই লেখার আগে একটা হীনমন্যতা এসে যায়। সেই হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলুন। আপনি শুধু আপনার অনুভূতির কথা লিখুন। খারাপ হল না ভাল হল, সেই ভাবনা শিকেয় তুলে রাখুন। কোথাও কিছু অসঙ্গতি থাকলে সম্পাদনার পর তা দেখবেন ঠিক হয়ে গেছে। আপনার লেখা সাজিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব আমাদের।

সাহস করে লিখুন। পাঠিয়ে দিন বেঙ্গল টাইমসের ঠিকানায়। আর হ্যাঁ, সঙ্গে ছবি থাকলে, তাও পাঠিয়ে দিন। যদি ছবি না থাকে! চিন্তার কিছু নেই। সবজান্তা গুগল তো আছেই।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা:

bengaltimes.in@gmail.com

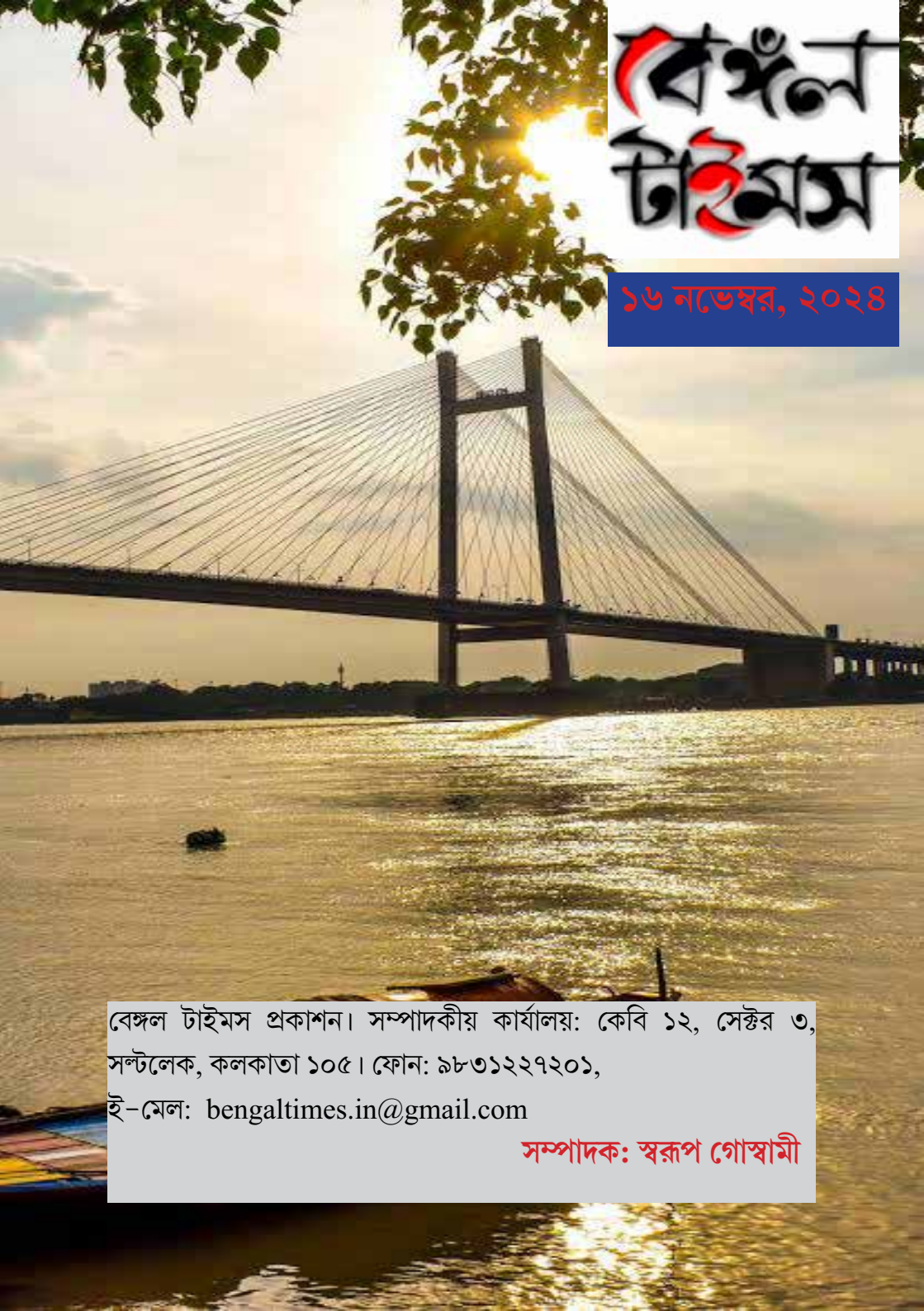

# বেঙ্গল টাইমস

১৬ নভেম্বর, ২০২৪

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন। সম্পাদকীয় কার্যালয়: কেবি ১২, সেক্টর ৩, সল্টলেক, কলকাতা ১০৫। ফোন: ৯৮৩১২২৭২০১,
ই-মেল: bengaltimes.in@gmail.com

সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী